চতুর্থত, মূলত দেবদেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য হলেও মঙ্গলকাব্যে মানুষের চরিত্রও অত্যন্ত সুচারুভাবে অঙ্কিত হয়েছে। ফলে চাঁদ সদাগরের দৃপ্ত ও অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, সনকার সকরুণ মূর্তি, ভাঁড়ুদত্ত ও মুরারি শীলের চাতুর্য ও খলতা প্রভৃতি অত্যন্ত ভালভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

● জীবনীকাব্য

মধ্যযুগের আখ্যানকাব্যের মধ্যে চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির মধ্যে জীবনীসাহিত্যের উৎস সন্ধান করা যেতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করেন। এইরকম জীবনীকাব্য যখন সংখ্যায় বেশ কিছু লেখা হয়েছে এবং কেবল চৈতন্যদেবের জীবনকথাতেই তা সীমাবদ্ধ নেই, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এমনকি অদ্বৈতাচার্যের স্ত্রী সীতাদেবীর জীবন নিয়েও চরিত সাহিত্য রচিত হয়েছে তখন মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যে এটিকে একটি বিশেষ ধারা হিসাবে স্বীকার করতেই হবে।

তবে সেই সঙ্গে একথাও বলতে হবে যে, এগুলি ঠিক মানবিক জীবনী হয়ে ওঠেনি, হয়ে উঠেছে সন্তজীবনী। ইংরেজীতে Biography এবং Hagiography-র মধ্যে যে তফাত, প্রকৃত জীবনীকাব্য ও মধ্যযুগের জীবনীকাব্যগুলির মধ্যেও সেই তফাৎ। ভক্তের দৃষ্টিতে আরাধ্যের জীবনের লৌকিক আচার-আচরণের চেয়ে অলৌকিক মাহাত্ম্য বেশি ধরা পড়ে, প্রকৃত জীবনীকাব্যে যা আমরা মোটেই আশা করি না। আসলে এগুলি চরিতসাহিত্য ঠিক নয়, 'চরিতামৃত'; এবং মূল পার্থক্যসূত্রও সেখানেই। এ বিষয়ে ড. সুশীলকুমার দে তাঁর গ্রন্থে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন—"It should, however, be remembered that it is not a *carita, but a caritamrita,* written more from the devotional than from the historical point of view.'

অবশ্য ভারতবর্ষে জীবনী রচনার ঐতিহ্য সংস্কৃত ও প্রাকৃতে দীর্ঘদিনের। পৃষ্ঠপোষক রাজাদের জীবনী কবিরা অনেক সময়ই রচনা করেছেন। এদের মধ্যে বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', হেমচন্দ্রের 'কুমারপাল চরিত', কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায় অনুবাদ কাব্যের কবিরা বা মঙ্গলকাব্যের কবিরাও পরোক্ষভাবে জীবনী রচনার প্রবণতা দেখিয়েছেন। যেমন সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় কিছুটা তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা রামপালেরই আংশিক জীবনকাহিনী। ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের তৃতীয় অংশে বস্তুত জীবনীকাব্যই রচনা করেছেন।

চৈতন্যদেবের জীবন নিয়ে সংস্কৃতে কিছু জীবনীকাব্য লেখা হয়েছিল, তার মধ্যে মুরারি গুপ্তের কড়চা, পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। বাংলায় রচিত চৈতন্য জীবনীগ্রন্থের মধ্যে সবেচের উল্লেখযোগ্য কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর লেখা 'শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত', কারণ এই গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের আকর গ্রন্থ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের বেদস্বরূপ। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে নাম করা যেতে পারে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', গোবিন্দদাসের কড়চা' এবং চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়'-এর।

খ. জীবনীসাহিত্য

জীবনীসাহিত্যের কথা মধ্যযুগীয় আখ্যান কাব্য প্রসঙ্গে একবার আমরা উল্লেখ করেছি, তবে প্রথমত তা ছিল পদ্যমাধ্যমে রচিত, দ্বিতীয়ত, তাদের আমরা বলেছি সন্তজীবনী, ফলে প্রকৃত জীবনীসাহিত্যের মূল্য তাদের আমরা দিতে চাইনি। মধ্যযুগে চৈতন্যদেব এবং তাঁর পার্ষদদের নিয়ে এরকম জীবনীকাব্য বা চরিতসাহিত্য লেখা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কড়চাও আছে। কড়চা বলতে সাধারণত ছোট জীবনীগ্রন্থই বোঝায় যাতে জীবনের বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে সংক্ষিপ্ত জীবনীচিত্র তুলে ধরা হয়।

অবশ্য আরো কিছু কিছু উদ্দেশ্যে কড়চা লিখিত হতো। সংস্কৃত আলংকারিকদের কাব্যজিজ্ঞাসা-সংক্রান্ত গ্রন্থ দুভাগে বিভক্ত থাকতো—কারিকা ও বৃত্তি। কারিকায় সংক্ষেপে সূত্রের মতো কোনো কথা বলে বৃত্তি অংশে তা ব্যাখ্যা করা হতো। অনেকে মনে করেন, সংস্কৃত 'কারিকা' থেকেই কড়চা শব্দটি এসেছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে—'জীবন বৃত্তান্ত বা ঐতিহাসিক ঘটনাদির বিষয় যাতে রক্ষিত হয় বা ঐ সকল বিবরণ ধ্বংস হতে রক্ষা করিবার জন্য যাতে লিখিত হয়।' সংস্কৃতে শ্রীরূপ গোস্বামীর কড়চা বিখ্যাত। মধ্যযুগীয় জীবনীকাব্যের মধ্যে গোবিন্দদাসের কড়চা অত্যন্ত বিতর্কিত এবং সেই কারণেই উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগের জীবনচরিত Hagiography-র অন্তর্ভুক্ত মনে করাই স্বাভাবিক, প্রকৃত Biography বা জীবনীসাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছে আধুনিক কালেই। মনে হতে পারে জীবনী রচনা খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর মতো জটিল সাহিত্যকৃতি কমই আছে। কারণ প্রথমত, জীবনী ইতিহাসেরই একটি শাখা। ব্যক্তিবিশেষের জীবনকাহিনী অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন হওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের একটি দলিল হয়ে থাকে সেটি।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যকৃতি হিসাবে গণ্য হতে গেলে তার মধ্যে সাহিত্যরস থাকতে হবে, নিছক জীবনীপঞ্জী হলে চলবে না। আলোচ্য চরিত্রটিকে নায়ক ধরে নিয়ে ধীরে ধীরে চরিত্রটির বিবর্তন দেখানো উচিত, কথাসাহিত্যের মতোই। তথ্যের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক জীবনচরিতকে নষ্ট করে ফেলে। এ বিষয়ে স্ট্র্যাচি-র মত স্মরণযোগ্য—'A mass of notes and documents is no more biography than a mountain of eggs is an omelette.'

বোধহয় এই কারণেই কেউ কেউ মূর্তি-অঙ্কনশিল্পী বা Portrait-painter-এর সঙ্গে জীবনচরিতকারের তুলনা করেন। মূর্তিতে যেমন লোকটির প্রকৃত চেহারা আঁকবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীকে শিল্পের প্রতিও সুবিচার করতে হয়, জীবনী লেখককেও আলোচ্য চরিত্রটি এমন ভাবেই আঁকতে হয় যাতে আর পাঁচজন সেই চরিত পাঠে উৎসাহ পান অথচ তথ্যের বিকৃতি কোথাও না ঘটে।

তৃতীয়ত, জীবিত মানুষ অথবা মৃত মানুষের জীবনী রচনা করা হবে, এবিষয়ে রচনাকারের মনে সংশয় থাকতে পারে। আলোচ্য ব্যক্তি জীবিত থাকলে তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য তাঁর কাছ থেকেই জেনে নেওয়া সম্ভব, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সন্ধান দুরূহ হয়ে পড়ে। তথ্যের স্বল্পতা নিয়েই সে ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হয়। কারো মৃত্যুর পর প্রকাশিতব্য জীবনীর ব্যাপারে আরো একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয় তখন সব গৃহীত তথ্যই ঠিক প্রকাশ্য থাকে না। সাধারণভাবে মৃত মানুষের ত্রুটিগুলি গোপন করে তাঁর গুণকীর্তনই প্রচলিত রীতি; যেখানে তা সম্ভব নয়, সেখানে ত্রুটিগুলির সাধ্যানুসারে অনুল্লেখই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া অনেক সময় একটি মানুষের এমন ভাবমূর্তি গড়ে উঠতে পারে যাতে কিছু তথ্য তাঁর ভাবমূর্তির ব্যাপারে ক্ষতিকারক বিবেচিত হতে পারে। সাধারণ মানুষের ধারণা যদি এতে প্রচণ্ড আহত হবার আশঙ্কা থাকে তবে সে তথ্য প্রকাশ না করাই বাঞ্ছনীয়। অথচ একটি ব্যক্তির পরিচয় দিতে গেলে তথ্যের বিকৃতি ঘটানোও বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। সেই কারণে এসব ক্ষেত্রে অতি সাবধানে অগ্রসর হতে হয়।

চতুর্থত, জীবনচরিত সম্বন্ধে ইংরেজিতে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলা হয় সেটি মনে রাখতে হবে, জীবনীরচনায় যেন 'Perfect Pattern of well-told life' বজায় থাকে। অর্থাৎ একটি জীবন পরিস্ফুট হয় অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে তার আচরণে এবং সেইসব চরিত্রের সঙ্গে বিভিন্ন আলাপচারিতায় বা সংঘর্ষে। এইসব অন্য চরিত্রের চিত্র যদি একেবারে অস্পষ্ট থেকে যায় তাহলে একদিকে যেমন জীবনীরচনায় 'perfect pattern' নষ্ট হয়, অন্য দিকে মূল জীবনও সুপরিস্ফুট হতে পারে না—তাকে অনেকটা আকর্ষণহীন মনে হয়। এই কথাই স্পষ্ট করে বলেছেন সমালোচক Andre Maurois– 'Secondary character must be delineated with the same care and love as the central figure. No man or woman was ever left to fight alone in the battle of life.'

পঞ্চমত, জীবনীচরিতের মাধ্যমে যদি কোনো নীতি বা আদর্শ প্রচার লেখকের উদ্দেশ্য হয় তবে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে তা করতে হবে। সবেচেয়ে ভালো হয় যদি এই নৈতিক আদর্শ বা মঙ্গলের কথা তিনি একবারও না বলে চরিত্রটিই নিষ্ঠার সঙ্গে এবং সাহিত্যিক রসবোধের সঙ্গে চিত্রিত করার চেষ্টা করেন। কারণ তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হলেই নৈতিক আদর্শ বা মঙ্গলের প্রচারাদর্শ সফল হবে। সমালোচক Maurois এ কথাটিও সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন—

> 'A Bethoven Symphony is highly moral; so is a great biography, not because the author lays down moral principles but because a great life is a thing of beauty.'

• জীবনী সাহিত্যের পরিচয়

সঠিক জীবনীসাহিত্য আধুনিক যুগেই দেখা গিয়েছে, এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বাংলায় এখনও সার্থক জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়নি, এমন কথা কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন। ঊনবিংশ শতকে প্রতিভার এক উজ্জ্বল সমাবেশ দেখা গিয়েছিল, অথচ রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কারো জীবন নিয়েই ঠিক তেমন কোনো জীবনীসাহিত্য লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। এই প্রচেষ্টা অনেক আগে আমরা দেখেছি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে, বেশ কয়েক বছর আগে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অমাবস্যার গান'-এ যেখানে ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনকে তিনি উপন্যাসের বিষয় করে তুলেছেন, সাম্প্রতিক কালে দেখেছি কিশলয় ঠাকুরের 'পথের কবি'-তে—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রচিত্রণে এবং একেবারে এই সময়েই রচিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাসকল্প দীর্ঘ রচনায়—'সেইসময়' ও 'প্রথম আলো'-তে।

একটু কালানুক্রমিক বিচার করতে গেলে বলতে হবে, বাংলা গদ্য সাহিত্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মুন্সী রামরাম বসুই প্রথম আধুনিক জীবনচরিতের লেখক যিনি 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচনা করেন। এরপর রাজা প্রতাপাদিত্যকে অনেকেই সাহিত্যের বিষয় করে নিয়েছেন —প্রতাপচন্দ্র ঘোষের দুখণ্ডে সমাপ্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের 'বউ ঠাকুরানীর হাট' পর্যন্ত তার প্রমাণ।

এর পরেই বোধহয় নাম করতে হবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের, যিনি বাংলার বহু কবিওয়ালার জীবন এবং কবিতা অনুসন্ধান ও উদ্ধার করে প্রকাশ করেছেন। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনী রচনা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থের মধ্যে স্থান পেতে পারে অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', নগেন্দ্রনাথ সেনের 'মধু-স্মৃতি', যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামমোহন রায়', চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর চরিত', মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ভূদেব চরিত' প্রভৃতি। লেখার গুণে যে সত্তজীবনীও পরম উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্ত শিশিরকুমার ঘোষের 'অমিয়নিমাই চরিত'। আধুনিক কালে 'এ ধরনের' জীবনচরিত রচনা করে সাফল্য ও প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। তাঁর 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ', 'পরমাপ্রকৃতি সারদামণি' ও

'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' এ কালের শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ। জীবনীসাহিত্য না হলেও লুপ্ত জীবনী উদ্ধারের কাজে পূর্বে অসাধারণ নিষ্ঠা দেখিয়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'সাহিত্য সাধন চরিতমালা'র প্রত্যেকটি গ্রন্থ আজকের সম্পদ। এ কালে মণি বাগচীও জীবনীসাহিত্যের একজন সার্থক রূপকার।

আমাদের দেশে সার্থক জীবনীগ্রন্থ রচনার একটি প্রতিবন্ধকতা সাধারণ পাঠকের মানসিকতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এ দেশ কর্তাভজার দেশ। এখানে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মানুষ পেলেই অল্পদিনের মধ্যেই তাকে আমরা অতিমানব বা ঋষি বানিয়ে তুলি, ফলে বিবিধ ত্রুটি ও যেসব মানবিক দুর্বলতার পরিচয়ে একটি মানুষ রক্তমাংসের সজীব মানুষ হয়ে উঠতে পারেন সেই দুর্বলতা বা ত্রুটির পরিচয় জীবনীলেখক দিতে পারেন না। ও দেশের জীবনীর সঙ্গে এদেশের জীবনীগ্রন্থের পার্থক্যই সেইখানে। বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ-এর জীবনী রচনা করেছিলেন ফ্রাঙ্ক হ্যারিস। তিনি শ-এর দুর্বল স্থানগুলি ঢেকে রাখবার কোনো চেষ্টাই করেন নি। বিখ্যাত মহিলা অ্যানি বেসান্ত শ-এর প্রণয়কাঙ্ক্ষিনী-ছিলেন। সে কথা হ্যারিস সবিস্তারেই লিখেছেন, তাতে সাধারণ মানুষের চোখে শ নিন্দনীয় হয়ে যাননি। বিবাহের পরও অনেক নারী এই বিখ্যাত নাট্যকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, হ্যারিস সেই কাহিনীও অত্যন্ত উপভোগ্য ভাবে পরিবেশন করেছেন। এতে তাঁর চরিত্রের হীনায়ন ঘটানো হল বলে নাট্যকার স্বয়ং অভিযোগ করেননি, তাঁর কোনো অনুরাগীও আক্ষেপ করেননি। অথচ এই একই ব্যাপার আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি করা হলে বেশ কিছু রবীন্দ্রানুরাগী যে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠতেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেতকী কুশারীর একটি গ্রন্থে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো সম্বন্ধে এই ইঙ্গিতই অনেকে ভালো ভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের নামে অলীক কল্পনা প্রকাশ করা গর্হিত কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখা উচিত যে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রতিভাশালী হওয়া সত্ত্বেও একজন রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন এবং তাঁর অনুভূতি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ও স্পর্শকাতর ছিল। এরকম একজন তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ তাঁর সম্বন্ধে একটা নারীর দুর্বলতা ও তার পরম নিবেদনকে উপলব্ধি করবেন এটা যেমন প্রত্যাশিত, একটি নারী এমন একটি যুগোত্তর পুরুষের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ ও ভক্তি-শ্রদ্ধা অনুভব করবেন এটাও অপ্রত্যাশিত নয়। সুতরাং এ থেকে কোনো গভীর গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠতেই পারে। তাকে আমরা অশ্রদ্ধেয়ই বা কেন বলবো এবং এরকম ঘটা অসম্ভবই বা কেন মনে করবো তার কোনো সংগত ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু এই মানসিকতা এখনো এখানে অব্যাহত আছে। যতদিন তা থাকবে ততদিন সঠিক জীবনী রচনার প্রতিবন্ধকতাও থাকবে।

● আত্মজীবনী

আত্মজীবনীকেও জীবনচরিতেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কিন্তু সাধারণ জীবনী বা Biography-র সঙ্গে আত্মজীবনী বা Auto-biography-র পার্থক্য এই যে, আত্মজীবনীতে স্বয়ং লেখকই নিজের জীবনী রচনা করেন। জীবনচরিত একেবারে সঠিক হতে পারে সেটি আত্মজীবনী হলেই, কারণ লেখকের অজানা তখন আর কিছুই থাকে না। সেইজন্যই ডঃ জনসন মনে করেছিলেন জীবনীগ্রন্থ স্বকৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা মনে করি এতে সুবিধার চেয়ে অসুবিধার

পরিমাণই বেশি। কারণ প্রথমত, জীবনী যখন একটি সাহিত্যকর্ম তখন উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হওয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। অথচ নিজেকে বস্তুগত ভাবে দেখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার—চরিত্রের সেই সংযম ও উদারতা অনেকের চরিত্রেই দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে আব্রাহাম কলির একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে যার বাংলা রূপান্তর এইরকম—

'কোন লোকের পক্ষে নিজের বিষয় লিখতে যাওয়া যেমন তৃপ্তিকর তেমনি কঠিন। নিজের কোন অকীর্তির কথা বলতে গেলে বুকে যেমন বাজে, তেমনি আত্মপ্রশংসাও পাঠকদের কাছে কর্ণপীড়াদায়ক।'

এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা খুবই শক্ত। নিজের প্রশংসা করতে গেলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই কুণ্ঠা হয়, কিন্তু সেটা না করলে সত্যরক্ষা করা যায় না। নিজের নিন্দা নিজের কলমে করা খুবই কঠিন ব্যাপার কিন্তু নিরপেক্ষ হতে গেলে তাও করতে হবে। অবশ্য এর বিপরীত ঘটনাই ঘটা স্বাভাবিক বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। নিজের প্রশংসার সময় যে-কোনো কেউ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে, সেটা পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন এবং বিরক্ত হবেন। নিজের যে নিন্দা লোকসমাজে প্রচলিত সে বিষয়ে কথা বলতেও হয়তো তিনি সঙ্কোচ বোধ করবেন। ফলে আত্মজীবনীতে আমরা সঠিক তথ্য পাবো না।

আত্মজীবনীর দ্বিতীয় অসুবিধা আরো গভীর। সকলেই নিজের কথা অপরের সামনে তুলে ধরতে পারেন না, সঠিক আত্মজীবনীর নিয়মও জানেন না। তিনি যে আত্মজীবনী লিখবেন তা অপরের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। এমন এমন কথা থাকতে পারে যা তাঁর নিজের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান মনে হলেও অপরের কাছে তার বিশেষ মূল্য নেই। ফলে তাঁর জীবনের অসংখ্য খুঁটিনাটি বা 'dullest details' অন্যের কাছে তুলে ধরা অর্থহীন। কতটুকু লিখবেন এবং কতোটুকু লিখবেন না, কোন্ ঘটনাকে বড় করে তুলবেন, কাকে ছোট, কোন্ ঘটনা পাঠককে কতোটা আনন্দিত করতে পারবে—এসব চিন্তা ভাবনা করেই আত্মজীবনী লেখা উচিত।

তৃতীয়ত, কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী জীবনচরিতের পক্ষে আবশ্যক হতে পারে, আত্মজীবনীর পক্ষে নয়। আত্মজীবনীতে জীবনের কোনও একটা আপাত-ক্ষুদ্র ঘটনা লেখকের কাছে অত্যন্ত বড়ো হয়ে উঠতে পারে, বাইরে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লেখক একেবারেই অনুল্লেখ্য মনে করতে পারেন। পরের ঘটনা আগে, আগের ঘটনা পরে—এইধরনের কালানুক্রম-ভঙ্গ প্রায়ই ঘটতে পারে এবং তা ঘটে বলেই আত্মজীবনী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি আত্মজীবনী। এর লেখক এই কথাটাই বলে নেবার চেষ্টা করেছেন—"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কি বাদ দেয়, কত কি রাখে। কত বড়কে ছোট করে, ছোটকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।"

ইংরেজি সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আত্মজীবনীর মধ্যে নাম করা যায় St. Augustine-এর Confessions, Rousseau-র Confissions, Gibbon-র Autobiography, Davies-এর Autobiography of a Super-Tramp, M.K. Gandhi-র My Experiments with Truth, Nirode C. Chaudhuri-র Autobiography of an Unknown Indian প্রভৃতি।

বাংলায় বেশ কিছু ভাল আত্মচরিত বা আত্মজীবনী আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন', রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ছাড়াও 'আত্মপরিচয়' ও 'ছেলেবেলা', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত', সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' প্রভৃতি।

● একটি আত্মজীবনীর পরিচয়

সজনীকান্ত দাস রচিত 'আত্মস্মৃতি' আসলে একটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য আত্মজীবনী। একদিকে এর বৈশিষ্ট্য, সমসাময়িক অনেক সাহিত্যিক এবং সাহিত্যিক-কলহের আলোড়ক ঘটনার পরিচয়; অন্যদিকে সরস ও সুখপাঠ্য এই গ্রন্থটি গল্পের মতোই পড়ে ফেলা যায়। প্রথম প্রকাশের সময় এটি তিনটি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে অবশ্য এক অখণ্ড সংস্করণও পাওয়া যায়। প্রথম খণ্ডে ছিল 'ঊনবিংশ তরঙ্গ' অর্থাৎ ১৯টি পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ডেও তাই, তৃতীয় খণ্ডে ছিল 'একাদশ তরঙ্গ'।

নিজের বংশ পরিচয় দিয়েছেন প্রথম তরঙ্গে। ঠিক বংশ পরিচয় নয়, নিজের জীবন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। বর্ধমানের মানুষ, মালদহে ও বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, রাজনীতিতে দীক্ষা, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএসসি পড়তে এলেন এবং 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পর পড়াশুনার পাট একেবারে চুকে গেল—এই দিয়ে প্রথম তরঙ্গ শেষ হয়েছে, তার মধ্যে সুধারাণীর সঙ্গে বিবাহও অবশ্য যুক্ত আছে। এরপর একাদশ তরঙ্গ পর্যন্ত সজনীকান্ত নিজের জীবনেরই বিশদ পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত ছোটবেলা থেকেই কীভাবে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যদের গ্রন্থ পাঠ করতে শিখলেন, গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন সেসব, ছোটবেলাতেই রাজনীতির রাহুগ্রাসে কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন, সাহিত্য সাধনা ছিল জীবনের ব্রত, বিজ্ঞান সাধনা ছিল মর্মের ব্রত। ভালো ছাত্র ছিলেন, দু-নৌকায় পা দিয়ে অনেকদিন চলেছেন, শেষ পর্যন্ত ছাড়তেই হল বিজ্ঞান সাধনা। শুরু হল কৃচ্ছ্রসাধনা—এখানে-ওখানে প্রুফ দেখা, ছেলে পড়ানো ইত্যাদি। সেই সঙ্গে মেসে থাকা, পড়াশুনা না চালানোর অপরাধে বাড়ির অর্থসাহায্য বন্ধ। কিন্তু আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল প্রখর, ফলে উপার্জনক্ষেত্রে দুর্গতি বেড়েই চলেছিল। একটা উদাহরণ দিই। শাঁসালো একটি টিউশনি ছিল, ছাত্রের বাবা কর্কশ কণ্ঠে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন—'ম্যাস্টার, ছেলে কেমন পড়ছে? পরে জানিয়াছিলাম ভদ্রলোক আমাকে অপমান করিবার জন্য প্রশ্ন করেন নাই, তাঁহার এইধারা বচন, কিন্তু আমার চট্ করিয়া রাগ হইয়া গেল। তরতর করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলাম। আর পড়াইতে গেলাম না।'

লেখক জীবনের সূচনা বেশ দীর্ঘায়িত ভঙ্গিতে লিখেছেন দ্বাদশ তরঙ্গে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় সবে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে এসেছেন দেশে, বার করেছেন 'শনিবারের চিঠি'। সম্পাদক যোগানন্দ দাসের পেছন পেছন ঘুরেও লাভ হয়নি, লাভ হল অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে। শান্তাদেবীর সম্পাদনায় 'প্রবাসী'তে দেওয়া হল কবিতা, শনিবারের চিঠিতেও তাই। মনোনীত, কিন্তু ছাপা হয় না। এদিকে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সহকারী হিসেবে চাকরি হয়ে গেল। মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে আলাপ

হয়েছিল, কাজী নজরুল ইসলামকেও দেখেছেন। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্ররচনার প্রুফ দেখে আশ্রয় পেলেন। প্রথম মুদ্রিত হল কবিতা শনিবারের চিঠিতে, 'আবাহন'—

'ওরে ভাই গাজি রে,
কোথা তুই আজিরে
কোথা তোর রসময়ী জ্বালাময়ী কবিতা।'

এর পরেই শারদীয় সংখ্যায় 'কামস্কাটকীয় ছন্দ'। পরিচিত হয়ে গেলেন। কিন্তু বিখ্যাত হলেন নজরুলের কবিতাকে ব্যঙ্গ করে এবং তা যে সজনীকান্তের, তা জানতে না পেরে নজরুল-মোহিতলালের ধুন্দুমার মসীযুদ্ধ একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার হয়ে থাকল। এই মসীযুদ্ধের প্রধান ইন্ধন ছিল বেনামে লেখা সজীনকান্তের—

"আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই,
আমি বুক দিয়া হাঁটি ইঁদুর-ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই। ...
আমি নাগশিশু, আমি ফণিমনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি,
আমি 'বে অব বিস্কে' 'সাইক্লোন' আমি মরুসাহারার আঁধি।"

'শনিবারের চিঠি' অবলম্বন করে কতরকম কাণ্ডকারখানা যে সজনীকান্ত করেছেন তার শেষ নেই। উদাহরণ হিসেবে Applied Literature Society-র কথা বলা যায়। এর বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল এই ভাবে :